দশম অধ্যায়

▲ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ঃ

ভাষা নদী প্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদীর প্রধান ধর্ম স্রোত বা গতি, ভাষারও তাই। নদী থেমে থাকা মানে তার মৃত্যুর সূচনা, কালে সে শুকিয়ে যায়। তেমনি ভাষা মানুষের মুখে, লিপিতে, গ্রন্থে তার প্রতিষ্ঠা হারালে ক্রমশ তা বালুকাময় শুকনো নদীর মতো অতীতের স্মৃতি চিহ্নে পরিণত হয় 'মৃত ভাষা' রূপে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে কোনো ভাষা কখনও মরে না, যদি সত্যি সত্যিই সে তার রূপ বদলায়। নদী যেমন বদলায় তার স্রোত মুখ, ভাষাও বদলায় তার ন্যূনতম একক 'ধ্বনি'। নদীর খাত বদলের মতো ভাষাও যুগে যুগে তার প্রকৃতি বদলায়। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের মতো মুল ভাষার ধ্বনি নিয়ে তার উচ্চারণ বা শ্রুতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধ্বনিকে বিচার করাই হল **ধ্বনিতত্ত্ব**। এক কথায় সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ভাষার ধ্বনি সংগঠন বিশ্লেষণকে বলে **ধ্বনিতত্ত্ব** বা **Phonology.**

● ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ঃ

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, ভাষা শরীরের ক্রম-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। এই পরিবর্তন ঘটে ভাষার বহিরঙ্গে এবং অভ্যন্তরে। বহিরঙ্গে পরিবর্তন ঘটে ভাষার মূল উপাদান ধ্বনিতে এবং অন্তরঙ্গ পরিবর্তন ঘটে অর্থে।

ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ এক ধারা— বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনুযায়ী দু-রকম ধ্বনি পরিবর্তন হয়—১. **সাধারণ** ধ্বনি পরিবর্তন। এখানে সাধারণত বাক্ ব্যবহারে বিশেষ অর্থ পার্থক্য ঘটে না। ২. **ব্যাকরণ সম্মত** ধ্বনি পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পেছনে ব্যাকরণের প্রভাব থাকে। এই দুটি কারণ ছাড়াও **নানা কারণে** ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন—উচ্চারণের ত্রুটি, জিহ্বার জড়তা, আরামপ্রিয়তা; ভৌগোলিক পরিবেশ, অবস্থান; শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি। ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ; বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের বাক্ ও উচ্চারণ ভঙ্গী; ভাষা ব্যবহারকারীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান; নিকটস্থ ধ্বনির প্রভাব ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তনের **বাহ্যিক কারণগুলোর** মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

☆ ১. ভৌগোলিক প্রভাব ঃ

একই ধ্বনি স্থান বিশেষে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষে পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, নির্দিষ্ট এলাকায় লোকেদের দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রক্রিয়াজাত কারণে ধ্বনির পরিবর্তন কখনও কখনও হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

☆ **২. সামাজিক প্রভাব ঃ**

দেশের সামাজিক অবস্থা ধ্বনির প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রভাব ফেলে। দেশে শান্তি থাকলে উচ্চারণ বিকৃতি কমে, কিন্তু অশান্তি বা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে বিশেষ শব্দ বারবার ব্যবহারে ধ্বনি পরিবর্তনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

☆ **৩. ঐতিহাসিক প্রভাব ঃ**

কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনের মতোই ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। যেমন—সিন্ধু > হিন্দু, নখহরণিকা > নরুণ।

☆ **৪. অন্য ভাষার প্রভাব ঃ**

ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক কারণে দুটি ভাষাভাষী মানুষের একত্র বাস, মেলামেশা প্রভৃতির কারণে উভয়ের ভাষার উচ্চারণ রীতি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটায়।

☆ **৫. ব্যক্তিগত প্রভাব ঃ**

ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ রীতি ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ক্রমে তা পরিবারের বা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তি প্রভাবশালী বা প্রতিভাবান হলে, এমনটি ঘটে। ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—ভাষার বিশেষত্বের জট খুললে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের বাক্ ব্যবহার পাওয়া সম্ভব।

☆ **৬. লিপি বিভ্রাট ঃ**

অপর কোনো ভাষার শব্দ লিখতে গিয়ে সম বর্ণের অভাবে কাছাকাছি উচ্চারণে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়, ফলে ধ্বনিতে পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যেমন, বাঙালি 'বসু' ইংরেজীর বদান্যে > বোস/বাসু; ক্যালকাটা > কলিকাতা, কোলকাতা, কলকাতা। আরবী 'প'-এর অভাবে লেখা 'পারশি' হয়েছে ফারশি, ফারসি।

ধ্বনি পরিবর্তনের **অভ্যন্তরীণ কারণ**গুলোর মধ্যে দুটো পৃথক বিভাগ করা যায়—(ক) **শারীরিক** কারণ, (খ) **মানসিক** কারণ।

● **ক) শারীরিক কারণজনিত ধ্বনি পরিবর্তন** ঘটে থাকে। যেমন—

১. বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি ঃ

বক্তার **বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি** থাকলে ধ্বনি যথাযথ ভাবে উচ্চারিত হয় না। কেননা বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যেই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। জিহ্বার জড়তা থাকলেও ত্রুটি ঘটে। যেমন—শ > স > ছ, তোতলার উচ্চারণ প্রভৃতি।

২. শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি ঃ

শ্রোতার **শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটির** জন্যে বক্তার কথা শ্রোতা যথাযথ শুনতে পায় না। কানের ত্রুটি থাকলে শব্দ বা ধ্বনি ঠিক্‌ঠিক্ শোনা যায় না, শ্রবণ ও বোধের ত্রুটিতে বা ঘাটতিতে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আবার, অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত শব্দ উচ্চারণের দোষে শ্রোতা যথার্থ উচ্চারণ না বুঝে ভ্রান্ত একটা ধারণায় তা ব্যবহার করে। যেমন—মোচলমান (< মুসলমান) সম্বোধন 'আচ্ছালামু আলায়কুম' > 'আর ছালায় ম্যালকুম' হয়ে যায় অনেক সময়।

Scanned with CamScanner

৩. অনুকরণ বা অনুসরণে অক্ষমতা ঃ

বক্তার অসাবধানতা, অজ্ঞতা, আলস্যের কারণে বুঝতে না পেরে শ্রোতার ভুল অনুকরণে অনেক সময় ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—কেউ কেউ 'ব্যবহার'কে বলেন 'ববহার'। বর্ণ বিপর্যয়ে—রিক্সা > রিস্‌কা প্রভৃতি।

৪. দ্রুত উচ্চারণের ত্রুটি ঃ

তাড়াহুড়ো করে কথা বলতে গিয়ে শব্দ মধ্যে কোথাও কোনো বর্ণ লুপ্ত হয়ে ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে দেয়। যেমন—কোথায় যাবে > কোজ্জাবে, মাস্টার মশাই > মাস্টামশাই ইত্যাদি।

৫. অল্প আয়াস বা আরাম প্রবণতা ঃ

বক্তা কোনো শব্দের সহজ উচ্চারণ করতে যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে বা সমীকৃত করে, কিংবা নতুন ধ্বনির আগমন ঘটিয়ে অথবা অন্য উপায়ে ধ্বনিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে, ফলে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন—কর্ম > কম্মো, জন্ম > জম্‌ম ইত্যাদি।

● **খ) মানসিক কারণজনিত ধ্বনি পরিবর্তন** অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে—

১. **সাদৃশ্যগত** কারণে ধ্বনির পরিবর্তন হয়। বস্তুত ধ্বনি পরিবর্তনে সাদৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন—বধূ > বৌ এবং বধূটিকা > বউড়ি শব্দ হয়েছে, শ্বশ্রূ > শাস > শাশুড়ী। ঝি > ঝিউড়ি, দ্বাদশ শব্দ সাদৃশ্যে হয়েছে একদশ > একাদশ।

২. **লোকনিরুক্তির** ফলে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। অপরিচিত এবং উচ্চারণ করা কঠিন, এমন শব্দ কম বেশি ধ্বনি সাম্যের সুযোগে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করে। ফলে শব্দটির উৎস নির্ণয়ে বিকৃতি জনিত ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে, এটাই লোকনিরুক্তি। সাধারণ মানুষ ব্যাকরণ না মেনে নিজের ইচ্ছেমতো শব্দের ব্যুৎপত্তি খোঁজেন। যেমন—ইং. হসপিটাল > হাসপাতাল, আর্মচেয়ার > আরাম কেদারা, বিস্ফোটক > বিষফোঁড়া ইত্যাদি।

৩. **শ্বাসাঘাত বা অসাবধানতা** জনিত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। অজ্ঞতা বা অসাবধানে শব্দের যথাস্থানে শ্বাসের আঘাত না পড়ে অন্যত্র শ্বাসাঘাত পড়ে, ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। এই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্য স্বরেও প্রভাব পড়তে পারে বা **স্বতো-দ্বিত্বভবন** ঘটে যায়। যেমন, 'গামোছা'—আদি স্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে হয় 'গাম্‌ছা', সকল > সক্কল, ছোট > ছোট্ট।

৪. **বিশুদ্ধি প্রবণতা ঃ** সাধু রীতিতে শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ ভেবে তাকে শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে বিকৃত হয়ে শব্দটি অশুদ্ধ হয়ে ওঠে, ফলে শব্দের ধ্বনি ও অর্থ পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন—বেনেগাঁও > বাণীগ্রাম, ইঁট আমতলা > ইষ্টআম্রস্তলক (গ্রামের নাম), পুষ্ট > পুরুষ্ট, উৎকৃষ্ট > উৎকৃষ্ঠ ইত্যাদি।

৫. **আবেগময়তা বা ভাব প্রবণতার** জন্যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। স্নেহ-প্রীতি বা শ্রদ্ধাবশে অনেক সময় কোনো কোনো শব্দকে অতিরিক্ত ধ্বনি দিয়ে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, যাতে শব্দটির মধ্যে ভালো লাগা বোধটি জড়িয়ে যায়। এরই ফলে ঘটে ধ্বনি পরিবর্তন (আবেগ বা ভাবের ঘোরে)। যেমন—আইমা > আম্মা > মাম্মা; বাবা > বাম্বাবা; দুষ্ট > দুষ্টু; বাবা > বাপু (বড়দের ক্ষেত্রে), কাকা > কাকু ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

৬. **অজ্ঞতা বশে** কখনও কখনও ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। হয়ত অজ্ঞতার জন্যেই উচ্চারণে অক্ষমতা আসে বা না জেনে ভুল শব্দ শুদ্ধ ভেবে উচ্চারণ করতে গিয়ে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। যেমন—ব্যাজ > ব্যাচ, ফর্ম > ফ্রম, উচ্চারণ > উশ্চারণ ইত্যাদি।

৭. **কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস** থেকে কোনো শব্দ উচ্চারণের যোগ্য না হলে, তাকে বিকৃত করে উচ্চারণের ফলে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন—বিদ্যুৎলতা দেবী স্বামীর নাম 'নাড়ু' বলে তাঁর নাম না নিয়ে সারা জীবনব্যাপী 'নাড়ু'কে বলেন 'গুলি', নাগু > সাবু ইত্যাদি।

৮. **অন্যমনস্কতা**-র জন্য বক্তা পরপর শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে বর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়ে ধ্বনির পরিবর্তন সাধিত করে। যেমন—এক কাপ চা > এক চাপ কা, হাতে ছাতি ইত্যাদি।

৯. **ছন্দের লালিত্য** বা কবিতার কোমলতার জন্য অনেক সময় ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। কবি সাহিত্যিকরা ছন্দ মিল বা ধ্বনির সূক্ষ্ম উচ্চারণে সচেতন ভাবেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটান। যেমন—জন্ম > জনম্, পাখি শব্দের সৌন্দর্য আনতে—পাখ/পাখালি; জগৎ 'জিনে' কাব্যিক কারণে পরিবর্তিত।

১০. **দীর্ঘ শব্দকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য** ধ্বনি পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন—খাইবার > খাবার, ক্যালিবার > ক্যালি, সারেগামা, ল.সা.ও ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ধ্বনি পরিবর্তনের উল্লিখিত কারণগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, পরিবেশ জনিত প্রভাব, ভাষা ব্যবহারকারীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, অন্য ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, নিকটস্থ ধ্বনির প্রভাব এবং শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি।

▲ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি বা ধারা ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ধারণা হলেই প্রশ্ন জাগে এই পরিবর্তন কি কোনও রীতি বা সূত্র মেনে চলে? উত্তর এক কথায় হ্যাঁ। ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন গণিতের ফর্মুলার মতোই নির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। তবে গাণিতিক ফর্মুলার ব্যতিক্রম না হলেও, ধ্বনি পরিবর্তনের ফর্মুলা তেমনটি নয়, এর ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ—ভাষা জড়বস্তু নয়। বুদ্ধিমান সামাজিক বোধসম্পন্ন প্রকৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ—মানুষই ভাষার জন্মদাতা, ভাষার ধারক, বাহক। তাই মানুষের মনে যা নেই, মানুষের ভাষাতেও তা নেই। মনের খেয়ালেই মনে নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে জন্মায়। আর তখনই ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মের রাজত্বে ব্যতিক্রমী ব্যাপার ঘটে। সর্বদা নয়, মাঝে মাঝে মানুষের মনে সাম্যবোধকে অগ্রাধিকার দিতেই—একই শ্রেণীর পদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ-কে নিয়মে একটা ধরাবাঁধা নিয়মে বাঁধতে চাই। এই সাম্যবোধের জন্যেই ভাষা যত জীবন্ত হবে, যত বেশি চলমান হবে, তত ব্যাকরণ হতে থাকবে সোজা—সহজ। যদিও তা চলতে থাকবে একটা সূত্র মেনেই।

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম মেনে মধু > মউ, বধূ > বউ হয়। প্রাচীন বাংলার পদের শেষে ই, উ পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় লুপ্ত হয়, তাই রাতি > রাত। সংস্কৃত যুক্ত ব্যঞ্জন > প্রাকৃতে যুগ্ম, কিন্তু বাংলায় একক ব্যঞ্জন হয়। এই নিয়মে সপ্ত > সত্ত > সাত, অষ্ট > অট্ঠ > আট। কিন্তু সর্ব > সব্ব > সব। 'সাব' নয় কেন? এটাই ব্যতিক্রম। এর কারণ তখন বহুবচন

Scanned with CamScanner

বোঝাতে 'সভা' শব্দের প্রচলন ছিল, সে সময় প্রাকৃত থেকে বাংলার জন্ম হয়েছে। এখন গণ, সমূহ, রাশি ইত্যাদিতে বহুবচন বোঝান হয়। কিন্তু 'সর্ব' এবং 'সভা' দুটো শব্দই ছিল বহুবচন জ্ঞাপক। তাই 'সভা' শব্দের প্রভাবে 'সাব' না হয়ে 'সব' হয়েছে।

সে কারণে ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের **দুটো বিষয় মনে** রাখতে হবে—১. ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম শুধু বিশেষ কোনও ভাষার, বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করার যোগ্য, অন্য কোনও অবস্থায় নয়। ২. শব্দের মধ্যে অবস্থিত ধ্বনিগুলোর সুনির্দিষ্ট সংস্থানেই কেবলমাত্র সূত্র অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটবে, অন্য কোনও ভাবে নয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি বা সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—যে কোনও ভাষাতেই বিচিত্র ভাবে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে। কেন, কিভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে তা ঘটেছে? ধ্বনি পরিবর্তনের প্রবৃত্তি কিরূপ? তা নিয়ে অনুসন্ধান করলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে না। ধ্বনি পরিবর্তনের এই **প্রবৃত্তিগুলো** মূলত **দুটি ধারায়** কল্পনা করা যায়—(i) **বিবর্তনমূলক বা সংযোগমূলক** ও (ii) **মনোবিষয়ক**। এর মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য ও বিভ্রান্তি। যাকে সহজ কথায় বলা যায় **সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন** ও **ব্যাকরণ গত ধ্বনি পরিবর্তন**। এগুলোর ভিত্তিতেই ভাষাবিজ্ঞানীদের বিস্তৃত গবেষণায় ধ্বনির প্রধান চারটি সূত্র বা **ধারা প্রতিষ্ঠিত**— ১. **নতুন ধ্বনির আগম**, ২. **ধ্বনিলোপ**, ৩. ধ্বনির **রূপান্তর** ও **সমন্বয়**, ৪. ধ্বনির **স্থানান্তর** বা **বিপর্যাস**। এদের প্রতিটি ধারায় আবার ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র রয়েছে।

▲ বিবর্তনমূলক বা সংযোগমূলক সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র ঃ

● ১. ধ্বনির আগমজনিত পরিবর্তন ঃ

ধ্বনি স্বর ও ব্যঞ্জন প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বভাবতই ধ্বনির আগমজনিত পরিবর্তন দু ধরনের হতে পারে—স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগম। এই নবাগত ধ্বনি শব্দের আদি-মধ্য-শেষে আসতে পারে।

ধ্বনির আগম চিত্র

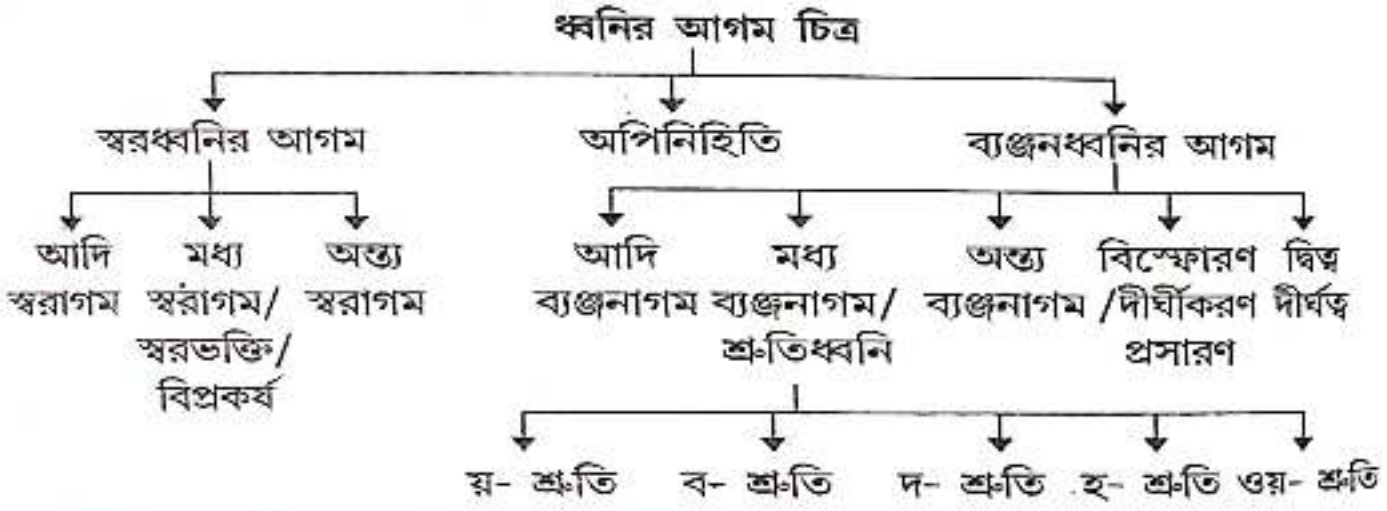

শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে **স্বরাগম** হয়। এটি **তিন** প্রকার।

Scanned with CamScanner

☆ক) আদি স্বরাগম (Vowel Prothesis) ঃ

শব্দের আদিতে ব্যঞ্জন থাকলে স্বাভাবিক প্রবণতায় উচ্চারণে অসুবিধার ফলে ব্যঞ্জনের সামনে একটা স্বরধ্বনি এসে পড়ে। একেই **আদি স্বরাগম** বলে। যেমন—স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্কুল > ইস্কুল প্রভৃতি।

☆খ) মধ্য স্বরাগম (Anaptysis) ঃ

উচ্চারণের সৌকর্য আনতে, অনভ্যস্ত সংযুক্ত ধ্বনিকে সরল করতে বা ছন্দের প্রয়োজনে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙে তার 'মধ্যে' স্বরধ্বনি নিয়ে আনাকে **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** বা **মধ্য স্বরাগম** বলে। যেমন—রত্ন > রতন, মুক্তা > মুকুতা, সৃজিল > সিরজিল ইত্যাদি।

☆গ) অন্ত্য স্বরাগম (Catathesis) ঃ

উচ্চারণের সৌকর্য লাভের জন্য শব্দের শেষে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে **অন্ত্য স্বরাগম** হয়। যেমন—কড়া > কড়াই, সত্য > সত্যি (ই), দিশ > দিশা (আ), দুষ্ট > দুষ্টু (উ) ইত্যাদি।

☆ঘ) অপিনিহিতি (Epenthesis) ঃ

শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ'কে আগেই উচ্চারণ করার রীতি বাংলা ভাষার এক বিশেষত্ব। এই রীতির নাম **অপিনিহিতি**। এই নাম ও সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে য-ফলাতেও 'ই' কারের আগম হলে অপিনিহিতি হয়। যেমন—'ই' = বাক্য > বাইক্য, রাখিয়া > রাইখ্যা, গাঁতি > গাঁইত, আজি > আইজ, 'উ' = সাধু > সাউধ, মাছ > মাউছুয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলার উপভাষা রাঢ়ীতে না থাকলেও বাংলাদেশে বঙ্গালীতে এবং সেখানকার কথ্য ভাষায় যত্রতত্র অপিনিহিতির ব্যবহার বর্তমান।

☆ঙ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম বা ব্যঞ্জনাগম ঃ

উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দে কোথাও অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের আগমন ঘটে, একে **ব্যঞ্জনাগম** বলে। স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনাগম প্রধানত **তিন প্রকার**—আদি-মধ্য-অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম।

(i) **আদি ব্যঞ্জনাগম (Consonant prothesis) ঃ** শব্দের গোড়ায় বা আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে, তাকে **আদি ব্যঞ্জনাগম** বলে। বাংলায় এই উদাহরণ খুবই কম। যেমন—উই > রুই, ওঝা > রোজা, ঋজু > রুজু, উপকথা > রূপকথা ইত্যাদি।

(ii) **মধ্য ব্যঞ্জনাগম বা শ্রুতিধ্বনি (Glide) ঃ** দ্রুত উচ্চারণের সময় জিভ উচ্চারণ স্থানে যাবার সময় অসতর্ক ভাবে যে ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যে অপ্রধান রূপে উচ্চারিত হয়, তাকে **মধ্য ব্যঞ্জনাগম** বা **শ্রুতিধ্বনি** বলে। এক কথায় শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে মধ্য ব্যঞ্জনাগম হয়।

শব্দ মধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগমন ঘটে সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতিধ্বনিগুলোর নাম দেওয়া হয়। বাংলায় প্রধান—য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি। এছাড়া—ওয়, দ, হ, র শ্রুতিও রয়েছে।

Scanned with CamScanner

ক) **য়-শ্রুতি** ঃ দুটি ধ্বনির মধ্যে 'য়'-এর আগম হলে 'য়'-শ্রুতি হয়। যেমন—কে এলো > কেয়েলো, সাগর > সায়র প্রভৃতি।

খ) **ব-শ্রুতি** ঃ দুটি ধ্বনির মধ্যে 'ব'-এর আগম হলে 'ব'-শ্রুতি হয়। যেমন—অম্ল > অম্বল, তাম্র > তাঁবা, আম > আঁব।

গ) **দ-শ্রুতি** ঃ দ-এর আগমে 'দ' শ্রুতি হয়—বানর > বাঁদর, সুনরী > সুন্দরী ইত্যাদি।

ঘ) **হ-শ্রুতি** ঃ শব্দ মধ্যে 'হ'-এর আগম হলে—নবীন > নহুলি, বিপুলা > বেহুলা।

ঙ) **'ওয়'-শ্রুতি** ঃ কোনো আলাদা চিহ্ন না থাকলে ওয়, ও, য় এই তিনটি অর্থ ব্যবহৃত হয় ওয়-শ্রুতিতে। যেমন—খাআ > খাওয়া, নাহা > নাওয়া ইত্যাদি।

(iii) **অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম** ঃ ভাবাবেগ বা কাউকে আদর করে ডাকতে গিয়ে শব্দ শেষে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের আগমন ঘটে যায়, একে বলে অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম। যেমন—খোকা > খোকন, জমি > জমিন, দিল > দিলেক (দেওয়া অর্থে), দেবে > দিবেক ইত্যাদি।

(iv) **বিস্ফোরণ বা প্রসারণ (Expansion)** ঃ অনেক সময় শব্দের দীর্ঘ উচ্চারণ করার জন্যে শব্দের মধ্যে ধ্বনির সংখ্যা বাড়িয়ে দেবার বা আগমন ঘটাবার প্রবণতা দেখা যায়, তাকেই বলে **বিস্ফোরণ বা প্রসারণ**। স্বরভক্তি বা অন্য কারণে এটা ঘটতে পারে। যেমন—পর্তু. পেরা > পেয়ারা, স্নান > সিনান, সং. পর্যঙ্ক > ব্রজবুলি পরিযঙ্ক, সং. প্রত্যাশা > ম. বা. প্রতিআশ, বিশ্বাস > বিশোয়াসা প্রভৃতি।

(v) **ব্যঞ্জন দ্বিত্বভাব বা দীর্ঘীকরণ (Gemination)** ঃ আধুনিক বাংলায় ধ্বনি পরিবর্তনে ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব বা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করা হয়, ফলে ব্যঞ্জনের আগম ঘটে যায় এবং সেই শব্দকে বিশেষ অর্থযুক্তও করে তোলা হয়। এই আগমন দ্বিত্ব বা দীর্ঘত্ব শব্দের সর্বত্রই (আদি-মধ্য-অন্ত্য) ঘটে থাকে। যেমন—সবাই > সব্বাই, তখনি > তক্‌খনি, ধুত্তোরি > ধুত্তরিকা, বললে > বুল্লেক, কিলা > কেল্লা প্রভৃতি।

● ২. ধ্বনির লোপজনিত পরিবর্তন ঃ

শব্দ উচ্চারণের সময় অসাবধানতার জন্য, শ্বাসাঘাতের ফলে বা দ্রুততার কারণে কোনো শব্দের ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায়, একেই বলে ধ্বনিলোপ।

স্বর-ব্যঞ্জন ছাড়াও সম ধ্বনি বা সম অক্ষরের লোপ বা সংকোচন ও দ্ব্যক্ষরতার ফলে লোপ সাধন ঘটে।

ধ্বনিলোপের চিত্র

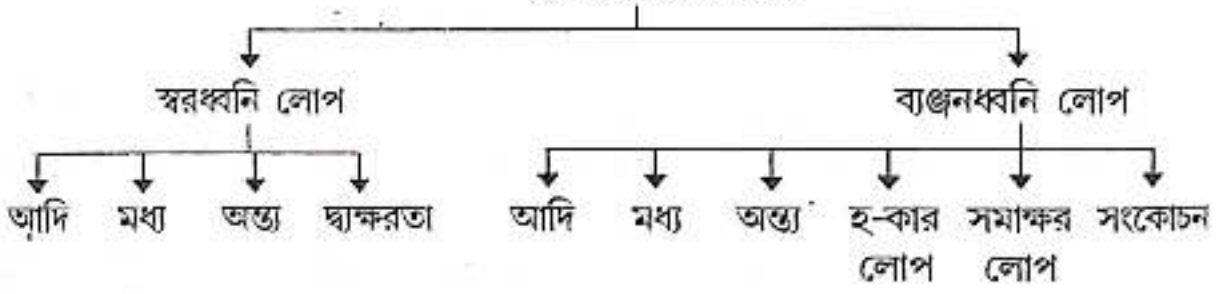

Scanned with CamScanner

☆ **ক) স্বরধ্বনি লোপ ঃ**

তিন প্রকারের হয়—আদি-মধ্য-অন্ত্য স্বরধ্বনি লোপ।

(i) আদি স্বরলোপ (Aphesis) ঃ শব্দের মধ্যে বা শেষে কোনও অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়লে এবং ঐ শব্দের প্রথমে কোনো স্বরধ্বনি থাকলে শ্বাসাঘাতের প্রভাবে স্বরধ্বনিটি ক্রমশ লুপ্ত হয়। একেই বলে **প্রারম্ভিক বা আদি স্বরলোপ**। যেমন—উদ্ধার > ধার, অলাবু > লাউ, এহেন > হেন, ওঝা > ঝা, আছিল > ছিল ইত্যাদি।

(ii) মধ্য স্বরলোপ (Syncope) ঃ কোনও শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়লে শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি দুর্বল হয়ে একসময় লুপ্ত হয়, একে **মধ্য স্বরলোপ** বলে। যেমন—পরিষদ > পর্ষদ, জানালা > জান্‌লা, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা, কলিকাতা > কলকাতা ইত্যাদি।

(iii) অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope) ঃ কোনো শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাতের জন্যে শেষের স্বর দুর্বল হয়ে ক্রমে লুপ্ত হয়, একেই বলে **অন্ত্য স্বরলোপ**।

যেমন—অগ্নি > অগ্‌গি > আগি > আগ, সন্ধ্যা > সাঁজ, রাশি > রাশ, জল > জল্, রাতি > রাত ইত্যাদি।

(iv) দ্ব্যক্ষরতা বা দ্বিমাত্রিকতা (Bisyllabism) ঃ শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে বলে অক্ষর। অক্ষরে স্বরধ্বনি থাকে মাত্র একটি। বাংলা উচ্চারণের একটা প্রবণতা—আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকার জন্য কোনো শব্দ বা পদ যতই দীর্ঘ হোক, উচ্চারণের সময় তা দু অক্ষরের বা দু মাত্রার গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সূত্রটিই হল **দ্ব্যক্ষরতা বা দ্বিমাত্রিকতা**। সাধারণ ভাবে শব্দের মধ্যে বা শেষের কোনো স্বরধ্বনি লোপের ফলে এটি ঘটে।

যেমন—বামুন + ঈ = বামুনী > বাম্‌নী, গামোছা > গাম্‌ছা, অপরাজিতা > অপ্‌রাজিতা, সারেগামা > সরগম ইত্যাদি।

☆ **খ) ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ ঃ**

স্বরধ্বনির মতো সর্বদা আদি-মধ্য-অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ পায় না, তবে অনেক সময়ই লোপ পায়। প্রথম ও শেষের ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন খুবই কম দেখা যায়। এটির কয়েকটি প্রকারভেদ রয়েছে—

(i) আদি ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ—প্রিয়া > পিয়া, স্থিত > থিতু, স্থান > থান ইত্যাদি।

(ii) মধ্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ—পাটকাঠি > পাকাটি, ফলাহার > ফলার, ঘোটক > ঘোড়া ইত্যাদি।

(iii) অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ—সখী > সই, বড়দাদা > বড়দা, বরগীর > বরগী, বধূ > বউ, মধু > মউ ইত্যাদি।

☆ **গ) হ-কার লোপ ঃ**

পদ মধ্যস্থ বা পদের শেষে 'হ'-কারের লোপ প্রবণতা বাংলা ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য। যেমন—ফলাহার > ফলার, কহি > কই, খড়দহ > খড়দা ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

☆ ঘ) সমাক্ষর লোপ বা সমধ্বনি লোপ (Haplology) ঃ

সম অক্ষর লোপ > সমাক্ষর লোপ। একই শব্দে পাশাপাশি অবস্থিত সমধ্বনি যুক্ত অক্ষর থাকলে, দ্রুত উচ্চারণ কালে একটি ধ্বনি বা অক্ষর লুপ্ত হয়ে যায়, একে বলে **সমাক্ষর লোপ বা সমধ্বনি লোপ**। যেমন—পটল লতা > পলতা, বড় কাকা > বড়কা, পাপোদক > পাদক, চক খড়ি > চাখড়ি, রবি কাকা > রবিকা ইত্যাদি।

☆ ঙ) সংকোচন (Contraction) ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত কোনো অক্ষর কমে গেলে তাকে **সংকোচন** বা **সঙ্কুচন** বলে। যেমন—কদলক > কলা, বৈবাহিক > বেয়াই, নখহরণিকা > নরুণ, সুবর্ণ > স্বর্ণ, পরিষদ > পর্ষদ প্রভৃতি।

● ৩. ধ্বনির রূপান্তর ও সমন্বয়জনিত পরিবর্তন ঃ

বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে কোনো ধ্বনি একে অন্যকে প্রভাবিত করে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির স্থান পরিবর্তন বা স্থান বিনিময় করে কিম্বা সমন্বয় ঘটায়, তখন তাকে **ধ্বনির রূপান্তর ও সমন্বয়** বলে।

এছাড়াও, উষ্মীভবন, স-কারীভবন, র-কারীভবন, ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন, মূর্ধন্যীভবন, স্বতোমূর্ধন্যীভবন, নাসিক্যীভবন, স্বতোনাসিক্যীভবন, বিনাসিক্যীভবন, ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, স্বতোঘোষীভবন, মহাপ্রাণীভবন, স্বতোমহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন, কণ্ঠ্যনালীয়ভবন, তালব্যীভবন, একীভবন, বিভাজন, অপশ্রুতি।

ক) অভিশ্রুতি (Umlaut) ঃ

স্বরধ্বনির বিপর্যয় বা অপিনিহিতির ফলে 'ই' বা 'উ' ধ্বনির যে স্থানচ্যুতি এবং তা অপর স্বরের প্রভাবে মিলিত হয়ে নব রূপ লাভ করে, তাকে বলে **অভিশ্রুতি**।

উল্লেখ্য, অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরের স্তর এবং এটি পশ্চিমবাংলার আদর্শ চলিত ও রাঢ়ীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একে এক ধরনের **অভ্যন্তর সন্ধিও** বলা যায়।

যেমন—আজি > আইজ (অপি) > আজ (অভিশ্রুতি); রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে, হাসিয়া > হেসে, বলিয়া > বলে, চারি > চার, শুনিয়া > শুনে ইত্যাদি।

খ) সমীভবন (Assimilation) ঃ

সমীভবন আসলে ব্যঞ্জনসঙ্গতি। শব্দমধ্যে পাশাপাশি দুটি পৃথক ব্যঞ্জন একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে একই বা প্রায় একই ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। তখন এই প্রক্রিয়াকে বলে **ব্যঞ্জনসঙ্গতি** বা **সমীভবন** বা **সমীকরণ**। মূলত দ্রুত বা অল্প শ্রমে উচ্চারণ প্রবণতা এবং শ্বাসাঘাতের ফলে এটি ঘটে।

বাংলায় **সমীভবন তিন প্রকার**—প্রগত, পরাগত, অন্যোন্য বা পারস্পরিক।

Scanned with CamScanner

i) **প্রগত (Progressive)** ঃ পূর্বের ধ্বনির প্রভাবে পরের ধ্বনিসাম্য লাভ বা প্রায় সম ধ্বনিতে পরিণত হলে **প্রগত সমীভবন** হয়। যেমন—পদ্ম > পদ্দ, অশ্ব > অশ্‌শ, পক্ক > পক্ক প্রভৃতি।

ii) **পরাগত (Regressive)** ঃ পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে পূর্বের ব্যঞ্জনসঙ্গতি বা প্রায় সাম্য লাভ করলে **পরাগত সমীভবন** ঘটে। যেমন—কর্ম > কম্ম, দুর্গা > দুগ্‌গা, তৎজন্য > তজ্জন্য, বীরনগর > বিন্নগর, পাঁচসের > পাঁশ্‌সের প্রভৃতি।

iii) **অন্যোন্য বা পারস্পরিক (Mutual বা Reciprocal)** ঃ পরস্পর ব্যঞ্জনের প্রভাবে দুটি ধ্বনিই রূপান্তরিত হলে **অন্যোন্য সমীভবন** হয়। যেমন—চারটি > চাট্টি, মহোৎসব > মোচ্ছব, বৎসর > বচ্ছর, মেঘ করেছে > মেক্করেছে ইত্যাদি।

গ) স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) ঃ

কোনো স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর কোনো স্বরধ্বনি সঙ্গতিলাভের উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে **স্বরসঙ্গতি**। একাধিক (উচ্চ বা নিম্নাবস্থিত) অসম স্বরধ্বনি সম্বলিত হয়ে উচ্চারণে সঙ্গতিলাভের চেষ্টা হয়। এই পরিবর্তন চার প্রকার হতে পারে—প্রগত, পরাগত, মধ্যগত ও অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি।

অ) **প্রগত স্বরসঙ্গতি** ঃ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরে পরিবর্তন ঘটলে **প্রগত** স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন—জুতা > জুতো, পুজা > পুজো, মুণ্ড > মুণ্ডু ইত্যাদি।

আ) **পরাগত স্বরসঙ্গতি** ঃ পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরে পরিবর্তন ঘটলে **পরাগত স্বরসঙ্গতি** হয়। যেমন—খোকা > খুকি, চাকরি > চাকুরি, দেশি > দিশি ইত্যাদি।

ই) **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি** ঃ পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে বলে **মধ্যগত** স্বরসঙ্গতি। যেমন—এখনি > এখুনি, বারেন্দা > বারান্দা, পিটানি > পিটুনি, বিলাতি > বিলিতি ইত্যাদি।

ঈ) **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি** ঃ কখনো একাধিক স্বরধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলে **অন্যোন্য** স্বরসঙ্গতি। যেমন—মধু > মেধো, যোগ্য > যুগ্যি, নাটকিয়া > নাটুকে, শহরিয়া > শহুরে ইত্যাদি।

ঘ) বিষমীভবন (Dissimilation) ঃ

সমীভবনের ঠিক উল্টো হচ্ছে বিষমীভবন। এখানে পদের মধ্যে একই ধ্বনি পাশাপাশি দুবার ব্যবহৃত হলে কোনো একটি ধ্বনি বদলে যায়, এই প্রক্রিয়াকে বলে **বিষমীভবন**। যেমন—শরীর > শরীল, লাল > নাল, মুকুল > মউল, পিপিলিকা > কিপিল্লিকা, (পালি) ইত্যাদি।

ঙ) উষ্মীভবন (Spirantization) ঃ

ক, গ, ত, দ, প, ব ধ্বনিগুলো (স্পৃষ্টব্যঞ্জন) উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু একবারে নির্গত না হয়ে, একটু বেশি সময় নিলে এই ধ্বনিগুলোর **উষ্মীভবন** হয়। অর্থাৎ উষ্ম ধ্বনিতে (শ ষ স হ) আংশিক বাধা পেয়ে উল্লিখিত স্পর্শ ধ্বনিগুলো উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হয় এবং উষ্মীভবন ঘটে যায়।

Scanned with CamScanner

চট্টগ্রামী বিভাষায় এরূপ উষ্মীভবন ব্যাপক দেখা যায়। যেমন—কালীপূজা > খালীফূজা, পায়রা > ফায়রা, কাগজ > খাঘজ-এর মতো শোনায়।

চ) স-কারী ভবন (Assibilation) ঃ

উষ্ম ধ্বনি স, শ ইংরেজী Z-এর মতো উচ্চারিত হয় বা স্পৃষ্ট ধ্বনিতে উষ্ম ধ্বনির প্রভাবে কিংবা সংস্পর্শে শিশ্ ধ্বনিতে পরিণত হলে, তাকে **স-কারীভবন** বলে।

যেমন—পাছে > পাসে, কিচ্ছু > কিস্সু, গাছতলা > গাস্তলা ইত্যাদি।

ছ) র-কারীভবন (Rhatacism) ঃ

স-এর উচ্চারণ যদি প্রথমে ঘোষ ধ্বনির মতো 'জ' হয়ে এবং শেষবধি 'র' হয়ে যায়, তখন তাকে বলে **র-কারী ভবন**। যেমন—দ্বাদশ > দুবাদস > বারহ > বার, পঞ্চদশ > পনর, ষট্দশ > ষোল (ড় > ল অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে ল-কারী-ভবনও হয়)।

জ) ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengtheminy) ঃ

সাধারণ ভাবে সমীভবনের ফলে যে সব যুক্ত ব্যঞ্জন যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয় (পদ্ম > পদ্দ), কাল প্রবাহে যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লুপ্ত হয়ে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়, কিন্তু অক্ষরের মাত্রার পরিমাণ বদলায় না এবং মাত্রার সমতা আসতে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরধ্বনি দীর্ঘ স্বরে পরিণত হলে, তাকে **ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন** বলে।

যেমন—সং. ভক্ত > প্রা. ভত্ত > বা. ভাত—প্রাকৃতে একটি 'ত' লুপ্ত হওয়াতে অ > আ তে পরিণত। এখানে 'অ' ধ্বনির দীর্ঘত্ব প্রাপ্তিই হল ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন। তেমনি সপ্ত > সত্ত > সাত; প্রস্তর > প্রস্বর > পাথর; ধর্ম > ধম্ম > ধাম প্রভৃতি।

ঝ) মূর্ধন্যীভবন (Cerebralisation) ঃ

ঋ, র, ষ প্রভৃতি মূর্ধা উচ্চারিত স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রভাবে দন্ত্য বর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হলে **মূর্ধন্যীভবন** হয়। যেমন—মৃত্তিকা > মাটি, বৃদ্ধ > বুড়া, চতুর্থ > চৌঠা, বিকৃত > বিকট ইত্যাদি।

ঞ) স্বতোমূর্ধন্যীভবন (Spontaneous Cerebralisation) ঃ

ঋ, র, ষ, বা কারও প্রভাব ব্যতীত দন্ত্য বর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হলে **অহেতুক বা স্বতোমূর্ধন্যীভবন** হয়। যেমন—বালতি > বাল্টি, তগর > টগর, পততি > পড়ে, তন্খা > টাকা ইত্যাদি।

ট) নাসিক্যীভবন (Nasalisation) ঃ

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখ ও নাক উভয় পথ দিয়ে বের হয় তাকে বলে নাসিক্য ধ্বনি। এই নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) নিজে লুপ্ত হয়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে, তবে তাকে বলে **নাসিক্যীভবন**। যেমন—হংস > হাঁস, চন্দ্র > চাঁদ, কন্টক > কাঁটা, দন্ত > দাঁত, কাপ > কাঁপ, বংশ > বাঁশ ইত্যাদি।

ঠ) স্বতোনাসিক্যীভবন (Spontaneous Naralisation) ঃ

নাসিক্য ধ্বনির লোপ বা প্রভাব ব্যতীত অকারণে কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেলে তাকে **স্বতোনাসিক্যীভবন** বলে। যেমন—পুস্তক > পুঁথি, পেচক > পেঁচা, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল, পিপিলিকা > পিঁপড়া, ইষ্টক > ইঁট ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

ড) বিনাসিক্যীভবন (Denasilization) ঃ

ক্ষেত্রবিশেষে কোনো শব্দের নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পায়। কিন্তু কোনো প্রভাব বা রেশ রেখে যায় না। একেই বলে **বিনাসিক্যীভবন**। যেমন—শৃঙ্খল > শিকল > শেকল। নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ঙ' লুপ্ত কিন্তু তার প্রভাবে কোনো স্বর অনুনাসিক হয়নি।

ঢ) ঘোষীভবন (Viocing) ঃ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় ধ্বনি এবং 'শ' অঘোষ ধ্বনি। আর সব ঘোষ ধ্বনি। কোনো অঘোষ ধ্বনি নিকটস্থ কোনো ঘোষ ধ্বনির প্রভাবে ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হলে, তাকে **ঘোষীভবন** বলে। যেমন—ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ, দিক্ + দর্শন = দিগ্‌দর্শন, ডাক্ + ঘর = ডাক্‌ঘর ইত্যাদি।

ণ) অঘোষীভবন (Devoicing) ঃ

ঘোষীভবনের বিপরীত অঘোষীভবন। অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে বা এমনিই ঘোষ ধ্বনির উচ্চারণ অঘোষ ধ্বনির মতো হয়, তবে তাকে **অঘোষীভবন** বলে। যেমন—বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর, বীজ > বিচি, অবসর > অপসর, ছাদ > ছাত, খবর > খপর ইত্যাদি।

ত) স্বতোঘোষীভবন (Spontaneous Voicing) ঃ

ঘোষ ধ্বনির প্রভাব ব্যতীতই অনেক সময় অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। একে বলে **স্বতোঘোষীভবন**। রাঢ়ী উপভাষায় এরূপ ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যেমন—কাক > কাগ্, শাক্ > শাগ্, ছাত > ছাদ। বঙ্গালীতে—শকুন > হগুন, ছোটো > ছোডো ইত্যাদি।

থ) মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) ঃ

বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ এবং 'হ' মহাপ্রাণ ধ্বনি, আর সব অল্পপ্রাণ ধ্বনি। মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ হলে, তাকে **মহাপ্রাণীভবন** বলে। যেমন—পাশ > ফাঁস, বিবাহ > বিভা, স্তম্ভ > থাম, দূর > ধুর, বুড়া > বুঢ়া প্রভৃতি।

দ) স্বতোমহাপ্রাণীভবন (Spontaneous Aspiration) ঃ

মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ব্যতীত কোনো অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ হলে সেই প্রক্রিয়াকে **স্বতোমহাপ্রাণীভবন** বলে। যেমন—পুস্তক > পুঁথি, পতঙ্গ > ফড়িং, বন্দুক > বন্দুক্ ইত্যাদি।

ধ) অল্পপ্রাণীভবন (Deaspiration) ঃ

কোনো মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে **অল্পপ্রাণীভবন** বলে। উল্লেখ্য, মহাপ্রাণহীনতা আধুনিক বাংলা ভাষার এক বিশেষ লক্ষণ। বাংলায় এর উদাহরণ প্রচুর। যেমন—মাছ > মাচ, দুধ > দুদ, হঠাৎ > হটাৎ, করছি > করচি, বাঘ > বাগ, ভাই > বাই, ভাত > বাত, মহার্ঘ > মাগ্‌গি (ভাতা) ইত্যাদি।

ন) কণ্ঠ্যনালীয়ভবন (Glothalization) ঃ

কোনো ধ্বনি উচ্চারণ কালে কণ্ঠ্যনালীর পেশী ও মুখগহ্বর যদি একই সঙ্গে সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ হয়, তাহলে **অন্তঃস্ফোটক ধ্বনির** সৃষ্টি হয়, একে বলে **কণ্ঠ্যনালীয়ভবন** বা **অবরুদ্ধ ধ্বনি**।

Scanned with CamScanner

এর উদাহরণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশযোগ্য বর্ণমালা বাংলায় নেই। এর ব্যবহার দেখা যায় পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের (বঙ্গালী) উপভাষায় যখন ঘোষ বা মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন—ভাই, ভাত ইত্যাদির উচ্চারণে কণ্ঠ্যনালীয়ভবনের জন্যেই হয় যথাক্রমে—বাই, বাত ইত্যাদি।

প) তালব্যীভবন (Palatalisation) ঃ

জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে উচ্চারণযোগ্য কোনো ধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বার পেছন ভাগ যদি তালু স্পর্শ করে তবে ঐ ধ্বনির **তালব্যীভবন** হয়ে থাকে। যেমন—অদ্য > অজ্জ > আজ, আদিত্য > আইচ, এডুকেশন > এজুকেশন, কুৎসা > কুচ্ছা, চিকিৎসা > চিকিচ্ছা ইত্যাদি।

ফ) একীভবন (Merger) ঃ

বিভাজনের বিপরীত প্রক্রিয়া একীভবন। কোনো স্বনিম স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে অন্য স্বনিমের সাথে মিশে গেলে, তাকে **একীভবন** বলে। যেমন—শ, ষ, স। এগুলো সংস্কৃতে আলাদা আলাদা স্বনিম ছিল, বাংলায় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একই স্বনিমের অন্তর্গত। যেমন—ন, ণ। ফলে ভাষার ধ্বনি সংখ্যাও কমে যায়। বাংলায় একীভবনের কারণেই বর্তমানে স্বনিম ৩১টি ('স্বনিম' পরে আলোচিত হয়েছে)।

ব) বিভাজন (Split) ঃ

একটি স্বনিম-ই (দান = দ + আ + ন। 'দ' মূলধ্বনি বা স্বনিম) ক্রমশ বিভাজিত হয়ে একাধিক স্বনিমে পরিণত হয়। এভাবে ভাষার গঠনগত পরিবর্তন অর্থাৎ একটি স্বনিমের একাধিক স্বনিমে পরিণত হওয়াকে **বিভাজন** বলে। বাংলায় 'ড' এবং 'ড়' এর উদাহরণ। পূর্বে স্বনিম হিসেবে একই ছিল, এখন আর তা নেই। যেমন—সোডা, রড, রেডিও এবং ড় এবং ড দুটি আলাদা স্বনিম।

ভ) অপশ্রুতি বা স্বরক্রম (Ablaut বা Vowel Gradation) ঃ

কোনো শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অক্ষুণ্ণ রেখে যদি স্বরধ্বনির একটির ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে এবং অর্থেও কিছুটা তারতম্য হয়ে যায়, তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে **অপশ্রুতি**। এই পরিবর্তন **তিনটি ক্রমে**—(ধাতু প্রত্যয় প্রথমে অক্ষুণ্ণ > পরে দীর্ঘ > শেষে ক্ষীণ বা লুপ্ত) সংঘটিত হয়। তাই একে বলে **স্বরক্রম**।

যেমন—'কৃ'-ধাতু থেকে যথাক্রমে করণ, কারণ, কৃতি, চলে > চালায় > চালে; ইংরেজী Give > Gave > Given-gift ইত্যাদি।

ম) বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস (Metathesis) ঃ

৪. (ক) দ্রষ্টব্য।

● ৪. ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাসজনিত পরিবর্তন ঃ

শব্দ মধ্যে ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে **বিপর্যয়** বা **ধ্বনি বিপর্যাস, বর্ণ বিপর্যয়** বা **ধ্বনির স্থানান্তর**। উচ্চারণের দ্রুততা বা অনায়াস উচ্চারণ প্রবণতায় এই পরিবর্তন ঘটে।

Scanned with CamScanner

ক) বিপর্যাস বা বর্ণ বিপর্যয় (Metathesis) ঃ

পদের মধ্যে দুটি ধ্বনি পরস্পরের সাথে স্থান বদল করলে, পদটি সামান্য বিকৃত হয়ে যায়, একেই বলে **বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস**। যেমন—বাক্স > বাস্‌কো, পিশাচ > পিচাশ, মশক > মকস, তলোয়ার > তরোয়াল ইত্যাদি। এই বিপর্যাস স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিতেই ঘটে।

খ) দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বা স্পুনারিজম (Spoonarism) ঃ

অনেক সময় দুটি ধ্বনি নয়, অসাবধানতা বশে বা উচ্চারণ শিথিলতার কারণে একটি বাক্যে দুটি ভিন্ন পদ স্থান বদল করে, একেই বলে **দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস**। ড. স্পুনার এরূপ ভ্রান্তির জন্য বিখ্যাত হন বলে, তাঁর নাম অনুসারে একে বলে **স্পুনারিজম**। বাংলায় উদাহরণ—এক কাপ চা > এক চাপ কা, কাবুলের আসানুল্লা > আবুলের কামানুল্লা ইত্যাদি।

● ব্যাকরণগত বা মনোবিষয়ক ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র ঃ

ব্যাকরণ বা অর্থের কারণে ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে থাকে। সাদৃশ্য, বিমিশ্রণ, লোকনিরুক্তি, জোড়কলম শব্দ, সংকর শব্দ, ভুয়া শব্দ, শব্দবিভ্রম, বিষমচ্ছেদ, পুনর্গঠন, যমক, সমমুখ ধ্বনি পরিবর্তন, বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

ক) সাদৃশ্য (Analogy) ঃ

কোনো শব্দের ধ্বনি বা অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই রকম নতুন শব্দ তৈরী হলে, সেই প্রক্রিয়ার নাম **সাদৃশ্য**। যেমন—বধূটি > বউড়ি শব্দের সাদৃশ্যে ঝিউড়ী, শাশুড়ী; টাকার কুবের > টাকার কুমীর, রোদসী > ক্রন্দসী ইত্যাদি (মানসিক কারণেও উল্লিখিত)।

খ) বিমিশ্রণ বা মিশ্রণ (Contamination) ঃ

একটি শব্দের প্রভাবে অন্য কোনো শব্দের রূপের পরিবর্তন ঘটলে এবং মূল শব্দের বিশেষ অংশ বাদ দিয়ে যে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়—ধ্বনি পরিবর্তনের এই সূত্রকে বলে **বিমিশ্রণ বা মিশ্রণ**। যেমন—রস ভর্তি ফল পর্তুগীজ 'আনানস' বাংলায় হয়েছে—'আনারস' (নস > রস)। রবীন্দ্রনাথ 'তড়িৎ' শব্দের প্রভাবে 'ঝটিৎ' শব্দ তৈরী করেছেন। 'কালিদাস' অনুসরণে ভুল বানানে ব্যবহৃত হয় চণ্ডিদাস, কালিপ্রসন্ন ইত্যাদি।

গ) লোকনিরুক্তি (Folk Etymology) ঃ

(মানসিক ধ্বনি পরিবর্তনের কারণেও আলোচিত) লোক সাধারণের জ্ঞান, বিশ্বাসে নির্ভর করে কখনো কখনো শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়, এরই নাম **লোকনিরুক্তি**। যেমন—শোভন পাপড়ি > শোন্ পাপড়ি, ভ্রমার্থী > ভীমরতি, উর্ণবাভ > উর্ণনাভ ইত্যাদি।

ঘ) জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word) ঃ

দুটি শব্দকে কাঁটা ছেঁড়া করে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেটি হল **জোড়কলম শব্দ**।

যেমন—হাঁস + সজারু = হাসজারু, ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা, জেদি + তেজালো = জেদালো, বক + কচ্ছপ = বকচ্ছপ; পয়োধর + ভার = পয়োভার, নিশ্চল + চুপ = নিশ্চুপ, পৃথু + স্থূল = পৃথুল ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

ঙ) সংকর শব্দ (Hybrid Word) ঃ

একাধিক ভাষার উপাদান নিয়ে কোনো ভাষায় যে নতুন শব্দ নির্মিত হয়, সেই শব্দগুলোকেই বলে **সংকর শব্দ**। যেমন—ইং. মাস্টার + বা. মহাশয় > মাস্টার মহাশয়/মাস্টার মশাই; পর্তু. পাও + হিন্দী, রোটি = পাউরুটি; ইং. হেড + বা. পণ্ডিত = হেডপণ্ডিত; বা. কহ্ + সং. তব্য = কহতব্য; ইং. মাস্টার + বা. প্রত্যয় ঈ = মাস্টারী ইত্যাদি।

চ) ভূয়া শব্দ (Ghost Word) ঃ

কখনও কখনও মূল হীন কল্পিত শব্দের উপাদানের সাথে বিভক্তি, প্রত্যয়, অনুসর্গাদি যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি হয়। অথচ শব্দটির মূল উৎস ঐ ভাষায় নেই-ই। এ ধরনের শব্দকে বলে **ভূয়া শব্দ**।

যেমন—'প্রোথ' ধাতুর সঙ্গে 'ইত' প্রত্যয় যোগে 'প্রোথিত'। কিন্তু এমন ধাতু সংস্কৃতে নেই। 'আবাহন' শব্দের মূল কল্পিত হয় 'আহ্বান' শব্দ। অকাট্য, লণ্ডভণ্ড, কহতব্য, হন্টন, অতিষ্ট, মোক্ষম প্রভৃতি ভূয়া শব্দের উদাহরণ।

ছ) বিষমচ্ছেদ (Metanalysis) ঃ

কোনো শব্দ সাদৃশ্য বা লোকনিরুক্তির কারণে ভ্রান্ত রূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন শব্দ বা প্রত্যয়ের জন্ম দেয়। তখন সেই ভ্রান্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে বলে **বিষমচ্ছেদ** বা **নিষ্কালন** বা **ভ্রান্তবিশ্লেষ**।

যেমন—'অসুর' শব্দ ভেঙে 'সুর' শব্দের অর্থ দেবতা। 'অ'-কে নঞর্থক উপাদান ভেবে ভ্রান্তবিশ্লেষ। 'বিধবা' শব্দের 'বি'কে উপসর্গ ভেবে শব্দ বিশ্লেষণে 'ধবা' শব্দের অর্থ হল 'স্বামী'। এই সূত্রেই 'বি'-এর বিপরীতার্থক 'স' উপসর্গ ভেবে তৈরি হয়েছে 'সধবা' শব্দটি। এমনই বয়সী, মুহুরী, করবী, আলগোছে প্রভৃতি শব্দ বিষমচ্ছেদের উদাহরণ।

জ) শব্দবিভ্রম (Malapropism) ঃ

বাক্যে একটি শব্দের স্থলে প্রায় সমধ্বনি বিশিষ্ট অন্য অর্থের শব্দ ব্যবহারে **শব্দবিভ্রম** ঘটে।

যেমন—"তোমার কোনো 'প্রিন্সিপল্' নেই" > "তোমার কোনো 'প্রিন্সিপ্যাল' নেই"। 'তোমার সঙ্গে উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই'—এই বাক্যে উদ্বন্ধনের অর্থ গলায় দড়ি। আসলে বাক্যটি হবে—'তোমার সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।' মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা' হয়েছে—'শ্রীমতিভগবতীর গীত' ইত্যাদি।

ঝ) পুনর্গঠন (Back Formation) ঃ

অন্য ভাষার কোনো শব্দকে বক্তা নিজের ভাষার কোনো প্রাচীন শব্দের মতো গড়ে নেয় এবং তাতে যেন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, একেই বলে **পুনর্গঠন** বা **পূর্বস্তরীয় পুনর্গঠন**।

যেমন—গ্রীক দ্রাখ্মে > সং. দ্রম্য > বা. দাম; পর্তু. Voila > বা. বেহালা. জার্মান ম্যাক্সমুল্যার > বা. মোক্ষমূলার প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

ঞ) যমক (Doublet) ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে দুটি ভিন্ন অর্থের শব্দ কালক্রমে একই রূপ ধারণ করে, তখন ঐ শব্দ দুটিকে বলে **যমক বা যমজ শব্দ**।

যেমন, ডাল—বৃক্ষের শাখা, ডাইল;জার্মান—বন (স্থান নাম) > বা. অরণ্য, রাজধানী; পড়ে—পঠন, পততি ইত্যাদি।

ট) সমমুখ ধ্বনি পরিবর্তন (Convergent Phonimic Change) ঃ

একাধিক শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যখন পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণে ও বানানে একই রূপ নেয়, তাকে **সমমুখ ধ্বনি পরিবর্তন** বলে।

যথা—সখী > সই, এবং সহি (স্বাক্ষর) > সই; সং, পঠতি > বা. পড়ে এবং সং. পততি > বা. পড়ে। বয়ন করা > বোনা (কাপড়) এবং বপন করা > বোনা (ফসল)।

আবার, কখনও এরূপ নতুন শব্দগুচ্ছে বানানে কিছু পার্থক্য অথচ উচ্চারণে সমতা থাকে, তখন তাকে বলে **সমধ্বনি** (Homophone)। যেমন—স্বর্ণ > সোনা এবং শ্রবণ করা > শোনা, বিশ-বিষ, কুল-কূল ইত্যাদি।

ঠ) বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন (Divergent Phonomic Change) ঃ

কালক্রমে একই শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে একাধিক শব্দে পরিণত হয় এবং তার অর্থ পার্থক্য ঘটে, তাকে **বিমুখ ধ্বনি পরিবর্তন** বলে। যেমন ঃ ভণ্ড > ভাণ ও ভাঁড়; শ্রদ্ধা > ছেদ্দা, সাধ, চিত্র > চিতা, চিত্তির প্রভৃতি।

☆ গ্রীমের সূত্র ঃ

য়্যাকপ গ্রীম নানা তথ্য প্রমাণে (জার্মান ভাষার প্রধান তিনটি শাখার ভাষার ভিত্তিতে) সূত্র বদ্ধ করেছেন যে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের নানা ভাষার ধ্বনির সাথে জার্মানিক ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মিত পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রীম তাঁর গ্রন্থে মূলত জার্মানিক শাখার নানা ভাষার ব্যাকরণের তুলনা করেন। এছাড়া দেখান মূল ভাষা থেকে জার্মানিক পৃথক হয়ে গেলে এই ধ্বনিগুলো এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়, যা অন্য বংশের ভাষাগুলোতে ঘটে না। এটাকে গ্রীম **তিনটি সূত্রে** ব্যাখ্যা করেন। সেগুলো—

(i) মূল ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ ধ্বনি জার্মানিক শাখাতে মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত। যেমন—সং. পিতৃ > গ্রীক Pater > ল্যাটিন Pater > জার্মানিক গথিক ভাষায় Fader (বর্গের ১ম > ২য় বর্গ) > ইং. Father.

(ii) মূল ভাষার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শ ধ্বনি জার্মানিক শাখায় অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি হয়েছে। যেমন—সং. দশ, গ্রীক deka, ল্যাটিন deceem, গথিক taitun, ইং, Ten (d > t এবং বর্গের ১ম বর্গ > ৩য় বর্গ)।

(iii) মূল ভাষার ঘোষবৎ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিতে পরিণত। সং. ভ্রাতা > ইং, brother, ভ > ব. বর্গের ৪র্থ বর্ণ > ৩য় বর্ণ।

এই সূত্র তিনটিকে একত্রিত করে বলা যায়—মূলের চতুর্থ, ৩য়, ১ম বর্ণ জার্মানিকে যথাক্রমে > ৩য়, ১ম, ২য় (উষ্ম) ধ্বনিতে পরিণত। তবে এই সূত্রের নানা ব্যতিক্রমও আছে। অনেক পরে গ্রাসম্যান ও কার্লভের্ণার আলাদা সূত্রের সাহায্যে ব্যতিক্রমগুলো দুর করেন।

Scanned with CamScanner

১।। শব্দার্থ তত্ত্ব ঃ সংজ্ঞা (Semantics)

অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টিই হলো 'শব্দ'। সুতরাং শব্দ মাত্রেরই অর্থ থাকবে। কিন্তু সেই শব্দ সর্বদাই তার 'আভিধানিক অর্থ'কে অবলম্বন করে চলে না। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার বারবার অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন— 'হাত' একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ = 'মানুষের অঙ্গ বিশেষ' (Hand)। কিন্তু যদি বলি—'এটা পাকা হাতের কাজ', তখন 'হাত' শব্দটির অর্থ হয় 'পটুত্ব বা দক্ষতা'। যদি বলি 'তোর হাতযশ আছে', তখন হাতের অর্থ 'খ্যাতি'। যদি বলি 'বাবুকে তুই হাত করেছিস', তখন হাতের মানে 'বশে আনা'। তেমনি 'হাতে খড়ি' (প্রথম শিক্ষা), 'হাত খরচ' (খুচরোখরচ), 'হাত বাঁধা' (নিরুপায়), 'হাতেধরা' (অনুরোধ) ইত্যাদি। সুতরাং 'হাত' একটি শব্দ—কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার নানা অর্থ, তার বহু রকমের মানে। এই হলো শব্দার্থ পরিবর্তন বা শব্দার্থতত্ত্ব।

ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের বিচিত্র রূপরেখা ভাষাবিজ্ঞানের যে-শাখায় আলোচিত হয়, তাকে শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) বলে।

ড. সুকুমার সেন বলেছেন ঃ 'শব্দার্থতত্ত্ব ঠিক ব্যাকরণের অঙ্গ নয়। তবে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহা আবশ্যিক অনুষঙ্গ'। চমস্কি শব্দার্থের উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতো অনেকেরই ধারণা, ভাষার প্রাণসম্পদ হলো শব্দার্থ। ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠন এই অর্থের উপরই নির্ভর করে। অর্থ জেনেই ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করা উচিত। সেজন্যে শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ॥

২।। শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ (= ১৫টি)

কারণ	উদাহরণ
১. ভিন্ন পরিবেশগত	(কলু = কলুজাতি >—তৈল পেষণ যন্ত্র >— পেষণযন্ত্র)
২. ভিন্ন ভাষাগত	(মুর্গ = মোরগ — ফারসীতে পাখি)
৩. ভিন্ন মানব গোষ্ঠীগত	(নীল = নীল,—গুজরাটিতে সবুজ)
৪. কালব্যবধান জনিত	(বিবাহ = বিশেষ বহন > পরিণয়)
৫. অর্থনীতি পরিবর্তন গত	(ঝি = কন্যা > কাজের মেয়ে)
৬. সংস্কার—প্রথাগত	(Mother = মা > সর্বশ্রেষ্ঠা সম্ভ্রান্তা নারী। লতা = সাপ)
৭. শোভনতা জনিত	(বাথরুম যাওয়া, স্বর্গগমন, হরিজন)
৮. শব্দ সাদৃশ্যজনিত	(তিল = শস্যদানা, দেহের তিল। রাজপথ, রাজহাঁস)
৯. অসতর্কতা / অজ্ঞতা জনিত	(পাষণ্ড = বৌদ্ধসন্ন্যাসী > নিষ্ঠুর)
১০. সাহিত্যিক-ব্যবহার	(বারুণী = বরুণের স্ত্রী (পূর্বে মদ্য)। ক্রন্দসী = আকাশ)
১১. অতিশয়িত ব্যবহার	(দা, দিদি, স্যার, বাবু, মা)
১২. শব্দ সংক্ষেপজনিত	(নিউজপেপার > পেপার / খাবার জিনিস > খাবার)
১৩. অলংকার ব্যবহার জনিত	(বই-এর পত্র, কাণ্ড, পর্ব। ভীষণ সুন্দর। ধর্মপুত্র)
১৪. নম্রতা / ক্রোধ প্রকাশ জনিত	(গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো। শালা, ছোটলোক)
১৫. প্রসঙ্গ পরিবর্তন জনিত	(মুখ, মাথা, হাত, কাঁচা, পাশ—নানাঅর্থ)

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১ [illegible]

[illegible]

[illegible]

২ [illegible]

[illegible]

ক [illegible]

খ [illegible]

গ [illegible]

ঘ [illegible]

৩ [illegible]

[illegible]

(ক) [illegible] (Blue) [illegible]

৪ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible] Mother [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Scanned with CamScanner

(গ) সামাজিক সৌজন্য রক্ষার্থে বাড়ির চাকরাণীকে ঝি না বলে 'কাজের মেয়ে' বলি। জুতোসেলাইকারী মুচিকে 'মিস্ত্রি' বলি। তথাকথিত মেথর চণ্ডাল প্রমুখ জাতিকে আমরা সেই নামে না-ডেকে 'হরিজন' বলি।

৮. শব্দ সাদৃশ্য জনিত কারণ

শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সদৃশ শব্দের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

(ক) 'তিল' ঃ তিল বলতে জানি, তেল আছে এমন কালো রঙের ক্ষুদ্র শস্যদানা। মানুষের গায়ে এরকম কালো কালো দাগকেও 'তিল' বলে। সাদৃশ্য বা দেখতে একরকম বলেই তিল শব্দের অর্থ পাল্টে গেল।

(খ) 'রাজপথ', 'রাজসাপ', 'রাজহাঁস', 'রাজমিস্ত্রী' প্রভৃতি ঃ 'রাজা' মানে বিশাল, বিরাট— শৌর্য-বীর্য-প্রতাপে ধনে সম্পদে। পথের সেই বিরাটত্ব বোঝাতে রাজপথ, হাঁসের বিরাটত্ব বোঝাতে রাজহাঁস, বিশাল সাপ বোঝাতে রাজসাপ ব্যবহার করি। অর্থাৎ বিশাল বা বিরাটের সাদৃশ্যে এই সব শব্দার্থ পরিবর্তন।

(গ) 'রাম' শব্দটিকেও আমরা বড় অর্থে ব্যবহার করি। যেমন— রামধনু, রামপাঁঠা, রামবোকা, রামছাগল প্রভৃতি।

৯. অসর্তকতা বা অজ্ঞতা-জনিত কারণ

আমরা অনেক সময় অসর্তকতা বা অজ্ঞতা বশত শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন ঃ

(ক) 'পাষণ্ড'— এর অর্থ ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। এখন অর্থ নিষ্ঠুর।

(খ) বাউল—একদা এর অর্থ ছিল ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদ। এখন অর্থ এক বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক।

১০. কবি-সাহিত্যিকদের শব্দ ব্যবহার জনিত কারণ

অনেক সময় কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের খুশি মতো কোনো কোনো শব্দকে অন্যঅর্থে ব্যবহার করেন। কখনো কখনো নতুন শব্দে তৈরী করে নেন। যেমন ঃ

ক. মধুসূদন বরুণের স্ত্রী এই অর্থে 'বারুণী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যথার্থ শব্দটি হতো বরুণানী। প্রচলিত বারুণী শব্দটির অর্থ মদ।

খ. 'ক্রন্দসী' মানে চিৎকারকারী সৈন্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্রন্দসী ব্যবহার করেছেন 'আকাশ' অর্থে।

Scanned with CamScanner

অনেক সময় কাউকে কাউকে সম্মান দিতে গিয়ে আমরা এত বাড়াবাড়ি করি, যাতে মূল অর্থটিই পাল্টে যায়। এবং মূলের অর্থ কমে যায়। যেমন ঃ

(ক) 'বড়দা'—বাসের কন্‌ডাকটরকে 'বড়দা' বলে ডাকি।

(খ) 'বাবু'—বাবু শব্দটি তেমনি অত্যধিক ব্যবহারে তার আগেকার উচ্চ মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। যত্রতত্র যাকে তাকে খুশি মতো বাবু বা এমনি মর্যাদা-সম্পন্ন শব্দে বারংবার ডাকা হচ্ছে। এতে শব্দটির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। একেই বলা হয় অতিশয়িত ব্যবহার। এমনি শব্দ প্রচুর— 'দিদি', 'দাদা', 'স্যার', 'বাবু', 'মা' (ভিখিরির ডাক)।

১২. শব্দসংক্ষেপ জনিত কারণ

অনেক সময় আমরা কোনো কোনো বড় শব্দকে সংক্ষেপ করে বলি। তাতেও শব্দার্থের এক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঃ

ক. নিউজ-পেপার-কে আমরা 'পেপার' বলি। তেমনি ক্যালিবারকে 'ক্যালি', বাই-সাইকেলকে 'বাইক' বা 'সাইকেল', শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ট্রেনকে 'শান্তি' বলি।

খ. বাংলাতে খবরের কাগজকে 'কাগজ', দণ্ডবৎ প্রণামকে 'প্রণাম', পুরোহিতকে 'পুরুত', খাবার জিনিসকে 'খাবার' বলি।

১৩. অলংকার ব্যবহার জনিত কারণ

অলংকার প্রয়োগেও শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়। রূপক, অতিশয়োক্তি, বক্রোক্তি, উপমা প্রভৃতি অলংকারের সাহায্যে শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। যেমন—

(ক) 'রূপক' অলংকারের সাহায্যে শব্দের অর্থ পরিবর্তন— গাছের পত্র, কাণ্ড, পর্ব ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে বইয়ের নানা অংশকে আমরা পত্র, কাণ্ড, পর্ব, শাখা বলে থাকি।

(খ) 'অতিশয়োক্তি' অলংকারের দ্বারাও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন— 'ভীষণ সুন্দর', 'আকাশ ভেঙ্গে পড়া', 'দারুণ নরম', 'বাড়ি মাথায় করা', 'ভয়ংকর মেয়ে'।

(গ) 'বক্রোক্তি'র সাহায্যেও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঃ জেলখানাকে বলে 'মামাবাড়ি' বা 'শ্বশুর বাড়ি', তেমনি মুরগীকে বলে 'রামপাখি', পুলিশকে বলে 'মামা'। তেমনি হাতটান, চক্ষুদান প্রভৃতি।

(ঘ) 'ব্যঙ্গোক্তি'র সাহায্যেও শব্দের অর্থপরিবর্তন ঘটে— অর্থের বৈপরীত্য দেখানো হয়। যেমন ঃ 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির', 'ধোয়া তুলসী পাতা', 'বড়খোকা', 'গঙ্গাজল' (প্রস্রাবকে)।

১৪. নম্রতা বা ক্রোধ প্রকাশ জনিত কারণ

অনেক সময় অতি-নম্রতা প্রকাশ বা প্রচণ্ডক্রোধ-প্রকাশে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঃ

(ক) নম্রতা প্রদর্শনে—'গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন', 'গরীবের বাড়িতে শাকঅন্ন', নিজের বাড়িকে 'গরীবের কুঁড়ে', পরের বাড়ীকে 'দৌলতখানা', অন্যকে খাওয়ালে 'সেবা করাবেন', প্রতিমা দেখাকে 'প্রতিমাদর্শন' বলেথাকি।

Scanned with CamScanner

(খ) প্রচণ্ড রেগে গেলে— অন্য মানুষকে 'জানোয়ার', 'ভূত', বোকা ছেলেকে 'মাথায় গোবর আছে', গালিগালাজ দিলে বেটা, শালা, ছোটলোক ব্যবহৃত হয়।

১৫. প্রসঙ্গ পরিবর্তন জনিত কারণ

সব ভাষাতেই এমন প্রচুর শব্দ আছে, যাদের এক এক প্রসঙ্গে এক একরকম অর্থ হয়। যেমন ঃ ঘর, মাথা, হাত, কাঁচা, পাকা, মুখ, চোখ, বুক, গা, মন, ছোট, বড়, বাসি, কাটা, ওঠা, বসা, ধরা প্রভৃতি। এদের মধ্যে একটি শব্দের ভিন্নার্থ দেখাই ঃ যেমন— 'মুখ' শব্দটি—

ক. মুখেআনা = কথাবলা
খ. মুখ খারাপ করা = গালিদেওয়া
গ. মুখচুন = লজ্জাপাওয়া
ঘ. মুখ রাখা = সম্মান বজায় রাখা
ঙ. মুখে আগুণ = মৃত্যু কামনা করা
চ. মুখপোড়া = সুনাম নষ্ট করা
ছ. মুখে ফুলচন্দন পড়া = শুভকামনা (আশীর্বাদকরা)
জ. মুখের কথা = অত্যন্ত সহজ।
ঝ. মুখে রক্তওঠা = দারুণ পরিশ্রম॥

৩॥ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

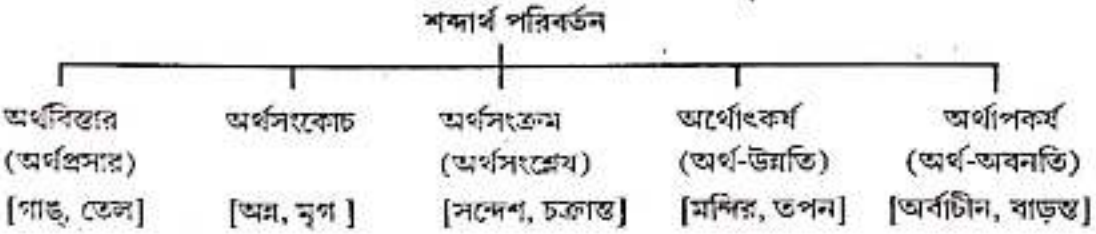

ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থ পরিবর্তন বা শব্দার্থতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা বড় সজীব বস্তু। সে নদীর স্রোতের মতো। নদীর স্রোতের মতোই সে বার বার ধারা পরিবর্তন করে, পুরনোখাত ছেড়ে নতুন খাতে চলে। এমনি করেই অনেক শব্দের এক-কালের-প্রচলিত অর্থ,—পরবর্তীকালে বদলে যায়। নতুন শব্দের মিশ্রণে তার অর্থে নতুন ব্যঞ্জনা আসে। শব্দের এই অর্থ পরিবর্তনের কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি চিত্রাকর্ষক। ভাষাবিজ্ঞানীরা শব্দার্থ পরিবর্তনের এই ধারাগুলিকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

এক॥ অর্থ-বিস্তার বা অর্থ-প্রসার।
দুই॥ অর্থ সংকোচ।
তিন॥ অর্থ-সংক্রম বা অর্থ-সংশ্লেষ।

এছাড়া শব্দার্থের উন্নতি (উৎকর্ষ) এবং অবনতি (অপকর্ষ) বিচার করেও শব্দার্থ পরিবর্তনের আরও দুটি ধারা উল্লেখ করা হয় ঃ

চার॥ অর্থোৎকর্ষ।
পাঁচ॥ অর্থাপকর্ষ।

Scanned with CamScanner

এক ॥ শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning) ঃ

যখন কোনো শব্দ তার বুৎপত্তিগত (সীমাবদ্ধ) অর্থ ত্যাগ করে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করে, তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনকে শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলে।

যেমন ঃ

(১) 'গাঙ' একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল 'গঙ্গা নদী'। পরবর্তী কালে এর অর্থ পরিবর্তিত হলো 'যে কোনো নদী'। এখন গাঙ মানে 'যে কোনো নদীর শুকনো খাত'।

(২) 'তেল' একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল— 'তিলের নির্যাস' বা তিল থেকে তৈরী নির্যাস। এখন তেল মানে তিলের নির্যাস তো বটেই, তিলছাড়াও সরসে, বাদাম, নারিকেল, তিসি, রেড়ি, মহুয়া ইত্যাদি যেকোনো শস্যদানা থেকে তৈরী যে কোনো নির্যাস। এখন অভোজ্য কেরোসিন, পেট্রলকেও তেল বলি।

(৩) তেমনি 'কালি' একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল কালো রঙের তরল, যা দিয়ে লেখা হয়। এখন এর অর্থ প্রসারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল।

(৪) অর্থ বিস্তারের আরও কিছু নমুনা ঃ

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. নগর =	ন + গম্ + ড; নগ + র (অস্ত্যার্থে)	পাহাড়ের উপরিস্থিত জনস্থান	শহর।
২. পাণি গ্রহণ =	পণ্ + ই; গ্রহ্ + অনট	হস্ত ধারণ	বিবাহ।
৩. মধুর =	মধু + র	মধুযুক্ত	সুস্বাদু।
৪. যথেষ্ট =	যথা—ইষ্ + ক্ত	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	প্রচুর।
৫. রাজ্য =	রাজন্ + য (যক্)	রাজার শাসিত দেশ	স্বাধীন দেশ।

দুই ॥ অর্থ সংকোচ (Reduction of Meaning) ঃ

যখন কোনো শব্দ তার ব্যাপকতর অর্থ হারিয়ে কোনো সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে অর্থের সংকোচ বলে।

(১) **'অন্ন'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল ভাত রুটি প্রভৃতি যে কোনো খাদ্য। এখন অর্থের সেই ব্যাপকতা হারিয়ে অন্ন মানে দাঁড়িয়েছে শুধু ভাত।

(২) **'মৃগ'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যে কোনো পশু। এখন শব্দটি তার এই অর্থ-ব্যাপকতা হারিয়েছে। এবং অর্থ দাঁড়িয়েছে—হরিণ নামের একবিশেষ পশু।

(৩) **'সম্বন্ধী'** একটি শব্দ। এর প্রাচীন অর্থ ছিল বড় ব্যাপক—যার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে সেইই সম্বন্ধী। এখন শব্দটি সেই ব্যাপক অর্থ হারিয়েছে। সংকীর্ণ অর্থপেয়েছে—স্ত্রীর ভাই বা শ্যালক।

(৪) অর্থসংকোচের আরও কিছু উদাহরণ ঃ

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. ভৃত্য	= √ভৃ + ক্যপ্	ভরণের যোগ্য	চাকর
২. ঘাস	= √অদ্ + ঘঞ	খাদ্য	তৃণ

Scanned with CamScanner

৩. বাসর	= √ বাস + অর	বাসগৃহ	সদ্য বিবাহিত বরবধূর থাকার ঘর
৪. হস্তী	= হস্ত + ইন্	হস্তের মত অঙ্গ যার	হাতী
৫. অসুখ	= ন + সুখ	সুখের অভাব	রোগ

তিন॥ অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ বা অর্থরূপান্তর (Atteration or Transfer of Meaning) ঃ

যদি কোনো শব্দের অর্থ ধাপে ধাপে বারবার পরিবর্তিত হতে হতে এমন ধাপে এসে দাঁড়ায়, যখন তার আদি অর্থের সঙ্গে শেষ অর্থের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, (বা এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে মনে হয়) তখন তাকে অর্থরূপান্তর বা অর্থসংশ্লেষ বলে।

যেমন—

(১) 'সন্দেশ' একটি শব্দ। তার আদি অর্থ ছিল সংবাদ। সেকালে ডাক ব্যবস্থা ছিল না। তখন লোকে আত্মীয়ের বাড়ীতে সংবাদ নিতে যেতো কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে। এই হিসেবে একদা এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল মিষ্টান্ন। তখন যে কোনো মিষ্টান্নকেই সন্দেশ বলতো (সেটা হল অর্থপ্রসার)। তারপর অর্থসংকোচ হয়ে এখন সন্দেশের অর্থ দাঁড়িয়েছে এক বিশেষ শ্রেণীর মিষ্টি।

সন্দেশ > সংবাদ > মিষ্টান্ন > বিশিষ্ট মিষ্টি। —এই হল অর্থরূপান্তর বা অর্থ সংক্রম।

(২) 'চক্রান্ত' একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল— চাকার শেষভাগ। তারপর বার বার অর্থ পরিবর্তন হতে হতে এখন চক্রান্তের অর্থ দাঁড়িয়েছে ষড়যন্ত্র। কিন্তু চাকার শেষ—এই প্রাচীন অর্থের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হলো শব্দের অর্থরূপান্তর বা অর্থসংক্রম।

(৩) 'গবাক্ষ' একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল গোরুর চোখ। তারপর কালে কালে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে জানালা। একদা গৃহস্থের মাটির বাড়িতে এখনকার গোল-ঘুলঘুলির মতো ঘরের দেওয়ালের কোনোস্থানে ছোট ছিদ্র রাখা হতো। তাতে জানালার মতো হাওয়া বাতাস ঢুকতো। ঘর থেকেও বাইরের জিনিস দেখা যেতো। কিন্তু সেই অর্থ এখন লুপ্ত হয়েছে। এই যে গোরুর চোখের সঙ্গে এখনকার জানালার আকারের কোনো মিল নেই অর্থ আছে—এই হলো অর্থ রূপান্তর।

(৪) অর্থ সংশ্লেষের আরও কিছু উদাহরণ ঃ

শব্দ	(ব্যুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. কাণ্ড	= কন্ + ড	গুঁড়ি	ব্যাপার।
২. ধর্ম	= √ ধৃ + ম (মন্)	ধারণশীল	পুণ্যকাজ।
৩. শর্করা	= √ শৃ + কর (করচ্)	কাঁকর	চিনি।
৪. বিরক্ত	= বি √ রন্জ + ক্ত	রক্তহীন	অসন্তুষ্ট।
৫. পট	= পটি + অ (অচ্)	বস্ত্র	চিত্র।

চার॥ অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ (Elevation of Meaning) ঃ

যখন কোনো শব্দ তার মূল অর্থ (হীন বা সাধারণ) পরিত্যাগকরে কোনো উন্নত অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাকে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ বলে।

Scanned with CamScanner

যেমন—

(১) **'মন্দির'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল গৃহ বা ঘর বা ঘুমোবার স্থান (মন্দির বাহির কঠিনকপাট।— গোবিন্দ দাস)। কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে— দেবালয়। এখানে শব্দটির অর্থগত উন্নতি বা উৎকর্ষ ঘটেছে ধর্মীয় ভাবের সংযোগে। (ভকত মন্দির মাঝে দেবতা প্রবীণ— রবীন্দ্রনাথ)। (যে কোনো ঘর> দেবতার ঘর)

(২) **'তপন'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যা তপ্ত করে। কিন্তু এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। এখন তপন মানে সূর্য।

(৩) **'দুহিতা'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল দোহনকারিণী নারী। এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। অর্থ দাঁড়িয়েছে কন্যা।

(৪) অর্থোৎকর্ষের আরও কিছু উদাহরণ ঃ

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. গোধূলি	= গো + √ ধূ + লি (ক্লি)	গোরুর ক্ষুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলো	সন্ধ্যা
২. পুরোহিত	= পুরস্ + √ ধা + ক্ত	অগ্রে স্থাপিত	পূজারী
৩. মার্জনা	= √ মার্জি + অ (অচ্)	ঘষা-মাজা	ক্ষমা
৪. ধরা	= √ ধৃ + অ (অচ্)	ধারণকারী	পৃথিবী
৫. দণ্ড	= √ দণ্ড্ + অ (অচ্)	লাঠি	শাসন

পাঁচ ॥ অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ (Deterioration of Meaning) ঃ

যখন কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে তার মূল উন্নত অর্থটি হারিয়ে ফেলে নিম্নতর বা অবনত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের অর্থাপকর্ষ বা অর্থাবনতি বলে।

যেমন—

(১) **'অর্বাচীন'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল নবীন। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে মূর্খ। নবীন অর্থটি উৎকর্ষ জ্ঞাপক। মূর্খ শব্দটি অবশ্যই অপকর্ষ সূচক। এইযে শব্দের উন্নতঅর্থ হারিয়ে অবনত-অর্থে ব্যবহার, এই হলো অর্থাপকর্ষ।

(২) **'অসুখ'** একটি শব্দ। এর আদিতে অর্থ ছিল-সুখের অভাব (এটি উন্নত অর্থ)। কিন্তু এখন অসুখ শব্দের অর্থের অবনতি ঘটে দাঁড়িয়েছে রোগ।

(৩) **'বাড়ন্ত'** একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যা বাড়ছে। কিন্তু এর অর্থের অবনতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুরিয়ে যাওয়া। ঘরে চাল বাড়ন্ত মানে চাল নেই।

(৪) অর্থাবনতি / অর্থাপকর্ষের আরো কিছু নমুনা ঃ

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. নাগর		নগরবাসী	অবৈধ প্রণয়ী
২. মহাজন		মহৎব্যক্তি	ঋণদাতা বা সুদের ব্যবসায়ী।
৩. ঝি		মেয়ে	বেতনভোগী কাজের মেয়ে
৪. ধীবর	= ধ + বর (বরচ্) (নিপাতিত)	বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ	জেলে
৫. অভিমান	= অভি-√ মন + অ(ঘঙ)	জ্ঞান	অহংকার
৬. বস্তি	= বস্ + ক্তি	বসতি	দরিদ্রদের মনবসতি-পূর্ণ পল্লী

Scanned with CamScanner